প্রথম

তনুশ্রী চক্রবর্তী

তখন খুব ছোট, সাড়ে তিন বা খুব বেশি হলে বছর চারেক বয়স হবে। প্রথমবার ভাইফোঁটা দেখব। বাবা–মায়ের একমাত্র সন্তান হওয়ার সুবাদে ভাইফোঁটা দেওয়ার সুযোগ ছিল না। নিজের কোনও ভাইবোন না থাকলেও মামারবাড়িতে পুজোর সময় উপস্থিত মাসতুতো দাদার সংখ্যা হত চার। মায়েরা বোনেরা যেহেতু বিয়ের পর মোটামুটি সবাই প্রবাসে তাই বোনে বোনে দেখা বলতে পুজোর ছুটির ওই ক'টা দিন। মাসিরা সব বছর সবাই আসতে পারতেন না, কিন্তু সেবারে একেবারে চাঁদের হাট বসে গেল বাড়িতে, মায়েরা খুড়তুতো, জ্যাঠতুতো সব বোনেরা একইসঙ্গে হাজির মামারবাড়িতে। কালীপুজোর দিন সেখানে লক্ষ্মীপুজো হত। তার দু'দিন পরেই ভাইফোঁটা। একেবারে সাজ–সাজ রব!

বাড়িতে ভাইফোঁটা হবে। মা–র পিসিরাও এসেছেন, তাঁরা ফোঁটা দেবেন দাদুদের দুই ভাইকে, মায়েরা মা'দের সবেধন নীলমণি একমাত্র খুড়তুতো ভাইকে। আর আমি আমার চার মাসতুতো দাদাকে। একে ছোট্ট মানুষ তার ওপর আবার জীবনের প্রথম ভাইফোঁটা, উত্তেজনা একেবারে তুঙ্গে। প্রশ্ন করে করে সবার মাথার পোকা বের করে দেবার উপক্রম করছি। কিন্তু কেউই আমার মনের মতো উত্তর দেয় না! কেউই বলে না এই তো এইবার হবে। সবার মুখে একটাই কথা, 'সে তো কাল সকালে, আজ নয়।' অতএব মনে শান্তি নেই, সুযোগ পেলেই হয় ফ্রকের বেল্ট নয় ফ্রকের ডিজাইন করা অরেঞ্জ টাই চলে যাচ্ছে মুখে। যতবার সেটা চিবোচ্ছি কেউ না কেউ দেখে ফেলছে! ব্যস, অমনি হয় গাল টিপে নয় হাত থেকে জামার বেল্ট বা টাইটা সরিয়ে দিচ্ছে নতুবা বকেঝকে চিবোতেই দিচ্ছে না একমনে। একে বুঝতে পারছি না ভাইফোঁটাটা কী জিনিস, তার উপর বলছে, 'আজ নয় কাল'। কিচ্ছু মাথায় ঢুকছে না। খালি বলছে, ফোঁটা দেয় কপালে, ফোঁটাটা কী তাই কি বুঝি ছাই! বলা তো দূরের কথা, কেউ পাত্তাই দিচ্ছে না, 'কাল দেখবিখন' বলে ভাগিয়ে দিচ্ছে। শেষে দিদা মানে আমার মায়ের কাকিমার কি মনে হতে হাত ধরে বলল, 'আয় দেখি আমার সঙ্গে'। আমিও চললাম হাওয়াই চটি ফটফটিয়ে। গিয়ে দেখি দরজার মাথায় মাথায়, রান্নাঘরের দেওয়ালে আঁকা কতগুলো লাল লাল টিপ, সেগুলো দেখিয়ে দিদা বললেন, ওগুলোই নাকি ফোঁটা! কী আশ্চর্য! ছোট বলে যা ইচ্ছে তাই বোঝালেই হল! অবাক হয়ে বললাম, 'ওটা ফোঁটা নয় গো দিদা, ওটা তো টিপ, মা পরে, বম্মা পরে, আমি জানি। কিন্তু দেওয়াল মা'র মতো টিপ পরেছে কেন?' আমার কথা শুনে দিদা হাসতে হাসতে দিদিমাকে বলতে শুরু করলেন, 'ও মেজদি আপনার নাতনির কথা শুনুন, চোদ্দো ফোঁটা দেখাচ্ছি, দেখে বলে এগুলো নাকি মা–জেঠিমার টিপ'। আমি তখনও বুঝে উঠতে পারছি না। দিদা হাসছে কেন, কিন্তু দিদার ওপর খুব রেগে যাচ্ছি। তবে ছোটদের রাগকে কে আর কবে পাত্তা দিয়েছে। আমার দুঃখ এবং রাগও তাই পাত্তাও পেল না তেমন। মাকে তো যমের মতো ভয় পেতাম। কাজেই তাঁর কাছে গিয়ে নালিশ করলে কপালে আরও কিছু দুঃখ লেখা আছে তা বিলক্ষণ জানতাম, তাই সে পথও না মাড়িয়ে অগত্যা পরের দিনের অপেক্ষাতেই থাকতে হল।

আমাদের ছোটবেলায় ওই সময়টায় একটু একটু ঠান্ডা পড়ত আর আমি ছিলাম সর্দি কাশির পার্মানেন্ট ভাড়াটে। সকাল থেকে দেখছি সব্বাই চান টান করে নিচ্ছে অথচ আমাকে আর কেউ চান করাচ্ছে না। এর মধ্যেই আবার কোত্থেকে কানে ঢুকেছে চান না করে ভাইফোঁটা দেওয়া যায় না। মা'র পায়ে পায়ে ঘুরঘুর করছি। মা তো বুঝতে পেরে বলে দিয়েছে, 'একটু বেলা হোক তারপর, এখন নয়'। অগত্যা ট্র্যাক চেঞ্জ করে দিদিমার গায়ে ঘেঁষছি যদি কিছু সমাধান হয়। দিদিমা তো লাল টুকটুকে ঠোঁট টিপে হাসতে হাসতে আমায় নিয়ে গিয়ে কাচা জামাকাপড় পরিয়ে মাথায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে চুলটুল আঁচড়ে দিয়ে বললেন, 'নে হয়ে গিয়েছে। বোঝানো হল, সক্কালবেলা ছোটদের নাকি ওভাবেই চান করতে হয়। মন না মানলেও দিদিমা যখন বলেছে সেটাই ঠিক। মেনে নেওয়ার উপরি পাওনা দিদিমার হাতে গড়া সন্দেশ, সেটাও খেয়ে নিতে হয় দুধ খেয়ে, ওতে নাকি দোষ নেই। কে আর জানত, ওগুলো লোভ দেখিয়ে খাইয়ে দেওয়ার কারসাজি। এইবার দিদমার সঙ্গে গেলাম বিরাট বড় ঘরটায় (বাইরের ঘর, দিদিমা ওই ঘরকে বৈঠকখানা–ঘর বলতেন)। গিয়ে দেখি দাদুরা, মামা, দাদারা সবাই সেজে গুজে আসনে বসে আছে। প্রদীপ জ্বলছে একপাশে, একটা থালায় সাজানো শাঁখ, ধানদুব্বো, তার একপাশে ছোট্ট বাটিতে চন্দনবাটা রয়েছে। আর কী ছিল তা মনে নেই। তবে এটা বেশ মনে আছে ঘরের একপাশে অনেকগুলো প্লেটে নানারকম মিষ্টি সাজানো। বড় থেকে ছোট এ ভাবে হবে, তাই মা–র পিসিরা দাদুকে দিয়ে শুরু করল ফোঁটা দেওয়া। দাদু যদিও চেয়েছিলেন এবার নিয়ম পাল্টাক। ছোট থেকে বড়, এ ভাবে হোক। পরে জেনেছি, তাতে কেউ রাজি হননি কারণ তাঁরা ভেবেছিলেন আমি নির্ঘাৎ ঘুমিয়ে পড়ব ততক্ষণে, যে হেতু আমার পাঁচ বছর হয়নি অতএব আমাকে দিয়ে আর ফোঁটা দেওয়ানো হবে না। জ্ঞাতিদের মধ্যেই কেউ দাদাদের ফোঁটা দিয়ে দেবে।

কী গভীর ষড়যন্ত্র ভাবা যায়। এদিকে তাঁদের সেই ষড়যন্ত্রে প্রায় একঘড়া জল ঢেলে ঘুম তো দূরের কথা, দিব্যি ড্যাবড্যাব করে তাকিয়েছিলাম। এতক্ষণে সবার দেখে দেখে মোটামুটি শিখে ফেলেছি কীভাবে ফোঁটা দিতে হয়। যেই আমার পালা এল ডান হাতের দুটো আঙুল চন্দনের বাটিতে ডুবিয়ে দিয়েছি। দিদিমা বুঝেছিল আমার দৌড়, তাই বোধহয় কোলে বসিয়ে হাত ধরে ফোঁটা দেওয়ালেন আমার দাদাদের। তাতেও কি রক্ষে আছে! এইবার শুরু হল ফিনিশিং টাচ। পরিত্রাহী কান্না, 'আমারও বোন চাই, ফোঁটা চাই।' মহা বিপদ! কে দেবে আমাকে ফোঁটা! যে যত ভোলায়, কান্না তত বাড়ে। শেষে দিদিমা উপায় বাতলালেন এভাবে, যে আমি তাঁর দিদিভাই। তাই তিনি আমার বোন। সুতরাং তিনিই ফোঁটা দেবেন আমাকে। রীতি মেনে দিলেনও। সেই আমার জীবনের প্রথম ভাইফোঁটার দেওয়া–নেওয়া। আজ দিদিমা নেই কিন্তু শৈশবের সেই প্রথম ফোঁটার স্মৃতি আজও জ্বলজ্বল করে কখনও বা মনখারাপের শিশিরবিন্দু হয়ে গড়িয়ে পড়ে বালিশে, ভাইফোঁটার হেমন্ত–ভোরে।

দিদিমা তো লাল টুকটুকে ঠোঁট টিপে হাসতে হাসতে আমায় নিয়ে গিয়ে কাচা জামাকাপড় পরিয়ে মাথায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে চুলটুল আঁচড়ে দিয়ে বললেন, 'নে হয়ে গিয়েছে। বোঝানো হল, সক্কালবেলা ছোটদের নাকি ওভাবেই চান করতে হয়। মন না মানলেও দিদিমা যখন বলেছে সেটাই ঠিক। মেনে নেওয়ার উপরি পাওনা দিদিমার হাতে গড়া সন্দেশ, সেটাও খেয়ে নিতে হয় দুধ খেয়ে, ওতে নাকি দোষ নেই

কবিতা

কী'রে ডাকবাক্সে একটাও চিঠি ফেলতে পারিসনি...

টিনের বাক্স
শঙ্কর ঘোষ

নদীর — ওপারে রেলস্টেশন
ডুরে শাড়ি — খুশির ঝিলিক — একটা
টিনের বাক্সে, কী যে নিয়েছে — সে...
পুরো একটা বেলা, ... তারপর, পথ জুড়ে
চেনা–চেনা গন্ধ, ... কাঠবাদাম গাছে
সেই বেনেবউ পাখিটা — আঁচলে হ্যাঁচকা
টান মেরে বলবে, ... কী'রে ডাকবাক্সে
একটাও চিঠি ফেলতে পারিসনি...
ছবিগুলো, অপত্যস্নেহের — ঝুলন্ত বৃষ্টির ফোঁটার মতো
সামান্য চতুর্ভুজ ঘরে ... ভিজে ভিজে শরীরের
গভীরতা ছাড়িয়ে, একটা আত্মহত্যা
সারার মুহূর্ত জুড়ে ...
সময় দুপুর, বনবাসের এই মূক বধির বিজনে
অবশিষ্ট নিশ্বাসের সাথে, দিগভ্রান্তের মতো
বিছানায় ... ছোট্ট একটা ছাতিম ফুল ...
জানালাটা, খোলা রেখে, ... নদীর ওপারে, রেলস্টেশনটা
প্রবল নির্জনতার নদীপথ বেয়ে বেয়ে ছুটে যাচ্ছে,
আর ছুটে যাচ্ছে, অরণ্য বৃক্ষের নিপুণ
নিশান উড়িয়ে — সীমাহীন শর্তশূন্য
অমোঘ বাতাসে ... টিনের বাক্স হাতে ...
কী রে, ডাকবাক্সে একটাও চিঠি ফেলতে পারিসনি...

ধোঁয়াশা
মুকুল ভট্টাচার্য

অনেকেই জানত
কীভাবে গলির ওই মুখে পৌঁছে যাবে
কোন ট্রেনে চেপে দিল্লি হয়ে
হরিদ্বার দেখে আসবে।
কলকাতার যানজট কেটে গেলে
কত তাড়াতাড়ি সিঁথির মোড়ে পৌঁছে
কাজ সেরে
সাঁতরাগাছি ফিরে আসবে
এ সব অনেকেই জানত।
সব যেন, তালগোল পাকিয়ে
একরাশ ধোঁয়া
এমনভাবে ঢেকে রেখেছে পথগুলো
স্থির করা যাচ্ছে না
রাস্তা ঠিক কোথায় গিয়ে শেষ হবে।
অনেকেই মাঝপথে হাবুডুবু খেতে খেতে ভাবছে
ফিরে আসবে?
না একটু এগিয়ে দেখবে
অমনি কুণ্ডলী পাকিয়ে ওঠে কালো ধোঁয়া।

সময় কখনও
আবদুস সামাদ

সময় কখনও কত অবলা
কথায় হয় জিরাফের গলা।
সময় কখনও বরফ হয়ে গলে
যায় শুধুই অথৈ জলের অতলে!
সময় কখনও দূর দাপটের অশ্বখুরে
ছোটে অপকটে ভবঘুরেরই বিশ্বজুড়ে।
সময় কখনও মন্দ বাতাসে
মন খারাপের রোয়াকে ব'সে
দিনের আলো গুটিয়ে সূর্যাস্তে বন্ধ্যা
হয়ে চুটিয়ে আড্ডা দেয় সকাল–সন্ধ্যা।

হেসে দেখাও, হেঁটে দেখাও
আশা ফিরদৌসী

বুকে ছুরি চালিয়ে ও' ধূর্ত–চতুর
বলে আমাকে, 'হেসে দেখাও'।
পথে কাঁটা–পাথর রেখে এ মূর্খ যুগ
বলে আমাকে, 'হেঁটে দেখাও'।

অঙ্কন ঃ শংকর বসাক